বিভূতিভূষণের ঘাটশিলা

সাগর বিশ্বাস

একসময় বাঙালিবাবুরা স্বাস্থ্যোদ্ধার কিংবা হাওয়া বদলের জন্য 'পশ্চিমে' যেতেন শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে তার বিস্তর 'প্রমাণ'রয়েছে। পশ্চিম বলতে বিহার ও উত্তর প্রদেশের কিছু ছোট শহর যেখানে প্রকৃতি ও পরিবেশ ছিল নির্মল, তাজা সব্জি, টাটকা মাছ - ডিম - দুধ -ঘি মিলতো সস্তায়। বিহারের ছোটনাগপুর বলয়ের প্রাকৃতিক দৃশ্য তো বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মোহমুগ্ধ করে তুলেছিল। তাঁর নিজের কথায়, 'সিংভূম জেলার বনজঙ্গল ও পাহাড়শ্রেণী ভারতবর্ষের মধ্যে সত্যিই অতি অপূর্ব এই সিংভূমের অন্তর্গত ঘাটশিলা তাঁকে এত আকর্ষণ করেছে যে তিনি সেখানে একটি বাড়ি পর্যন্ত করে ফেলেছিলেন। নিজের বসবাস করা সম্ভব ছিল না, অতএব ছোটভাই নুটবিহারীকে সেখানে বসিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন ডাক্তার। বিভূতিভূষণ সময় সুযোগ হলেই ঘাটশিলায় ভাইয়ের কাছে চলে যেতেন আর দিনকতক প্রকৃতির রূপসায়রে স্নান করে ফিরে আসতেন। এই স্নানের বর্ণনা তাঁর 'বনে পাহাড়ে'র মধ্যে বিস্তর লিপিবদ্ধ আছে, যেমন, 'এক রবিবার সুবর্ণরেখার ওপারে পিকনিক করতে গেলাম। আমার ভাই নুটু, তার বন্ধু সুরেশ, আরও দু'তিনজন। চৈত্রের প্রথম। মহুয়া গাছে ফুল ফুটে টুপটুপ গাছের তলায় পড়ছে। লতা - পলাশের ফুল ফুটেছে। গাছের ডালে ডালে জড়িয়ে উঠেছে পলাশের লতা। গোলগোলি গাছে হলদে ফুল। দুই পাহাড়ের মধ্যে দিয়ে আমরা কতদুর চলে গেলাম। এই সময়ে কেঁদফল পাকে, সিংভূমের বনের বড় সুমিষ্ট ফল। ...পাহাড়ের মধ্যে ঢুকে আমরা একটা অনাবৃত উপত্যকা বেয়ে চলেছি কতদূর। চৈত্রের রোদ চড়ছে যতই, ততই টুপটাপ করে মহুয়া ফুল ঝরে পড়ছে গাছ তলায়। ঝাঁটিফুলের মৃদু দুর্গন্ধ বাতাসে, এক স্থানে একটি ক্ষুদ্র উপত্যকার মাঝখান দিয়ে চলেচে। ঝর্ণার দু'পাশে বন্য জামবৃক্ষের সারি। ছায়া পড়েছে জলে। আমরা এই জায়গাটা পিকনিকের জন্যে ঠিক করে ফেললাম। গর গাড়ীর থেকে জিনিষপত্র নামানো হল।.... আমি একটু পরে সামনের ক্ষীণ পথরেখা বেয়ে সামনের দিকে চললাম। দেখিনা, ওদিকে কি আছে।'

এভাবে প্রকৃতি - যাপন করে ফিরে আসার মধ্যেই আর একবার যাবার প্রস্তুতি নিহিত থাকতো বিভূতিভূষণের। ১৯৫০ সালে শেষবারের মতো গিয়ে ঘাটশিলার বাড়িতেই তাঁর শেষ নিশ্বাস পড়ে।

বাঙালি লেখকদের তীর্থক্ষেত্র এই ঘাটশিলা দেখার বাসনা বহুদিন ধরে মনের মধ্যে জমা ছিল। অতএব এক সকালে সদলবলে হাওড়া স্টেশানে ইস্পাত এক্সপ্রেসে চলে বসলাম। এ গাড়িটা ছাড়ে ৬ - ৫০ এ। বেলার দিকে আছে কুরলা এক্সপ্রেস, বিকেলে স্টীল। প্যাসেঞ্জার ট্রেন তো আছেই। দু'একটা সুপারফাস্ট ট্রেন ছাড়া টাটানগরগামি প্রায় সমস্ত এক্প্রেস ট্রেনই ঘাটশিলা দাঁড়ায়। তাছাড়াকলকাতা - রাঁচি এক্সপ্রেস বাসগুলিতেও ঘাটশিলা যাওয়া যায়। আমরা বিনা রিজার্ভেশানে হলেও ইস্পাতকে বেছে নিয়েছি এজন্য যেসে বেশ সুবিধেজনক সময়ে ঘাটশিলা পৌঁছয়। দক্ষিণপূর্ব রেলপথের খরগপুর, ঝাড়গ্রাম হয়ে ঘাটশিলার দূরত্ব মাত্র ২১৫ কিলোমিটার। ৩ ঘন্টা ৪০ মিনিট ছুটে বেলা ঠিক সাড়ে দশটায় ইস্পাত আমাদের ঘাটশিলা নামিয়ে দিয়ে গেল।

কোথায় উঠবো কিছু ঠিক করা নেই। কলকাতা থেকে এক লেখক বন্ধু বলেছিলেন বিভূতি সংস্কৃতি সংসদের সাথে যোগাযোগ করতে। ওঁরা নাকি বাঙালি ভ্রমণার্থীদের মুশকিল আসান করে থাকেন। কিন্তু কোথায় কী! সংসদের কর্তাদের দেখা পাওয়াই ভার। 'সবে ধন নীলমণি' গোছের এক মহাব্যস্ত কর্তাকে খুঁজে পেতে যদিও বা ধরা গেল, তিনি 'দুঃখিত'। তবে অ

ামরা শেষপর্যন্ত এমন একটি জায়গার সন্ধান পেয়ে গেলাম যা অনেকদিন মনে রাখার মতো।
নবাব কুঠি। প্রায় একশো বিঘে জমির উপর একটি পুরনো বাড়ি। ১৯৪০ সালে ইংরেজদের কাছ থেকে কিনেছিলেন টিপু সুলতানের ষষ্ঠ বংশধর জনৈক কামগার শাহ। তৎকালীন মেদিনীপুর এস্টেটের এই বাড়িটার কামগার - পুত্র আহমেদ শাহ থাকেন সস্ত্রীক। বাড়ির একাংশে একটি হলিডে হোম, আউট হাউজের কিছুটা সরকারি দপ্তরের ভাড়া দেওয়া, কিছুটা ডরমিটরি। সবুজ ঘাসের আস্তরণ ও আম কাঁঠালের বাগানসহ এই বিরাট ক্যাম্পাস দেখে আমাদের সব দুঃখ মুছে গেলে া। পরে জেনেছি ঘাটশিলায় থাকার জায়গার অভাব নেই। গ্রিন, সাফারি, আনন্দিতা, রণধারওয়ার মতো বড় হোটেল যেমন আছে, পথের পাঁচালি, পান্থনিবাসের মতো মাঝারি ওছোট হোটেলও প্রচুর। রয়েছে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের হলিডে হে াম, গেস্টহাউস, ধরমশালা এবং সরকারি ইনস্পেকশান বাংলো। তাছাড়াঅনেক প্রাইভেট বাড়ি আছে যা ভ্রমণার্থীদের ভ াড়া দেওয়া হয়। শহর থেকে ১০ কিলোমিটার দূরে গালুডিতে গড়ে তোলা হয়েছে আধুনিক মানের রিসর্ট ‘সুবর্ণরেখা।’
প্রথম দিন। তাড়াহুড়ো করার দরকার নেই। স্নানাদি সেরে নিকটবর্তী হোটেলে খেয়ে এলাম আমরা। বৈকালিক বিশ্রামের পর সন্ধ্যায় সবাই মিলে এক চক্কর শহরের হাল হকিকত দেখে এলাম। পুজোর মধ্যে এসেছি। মন্ডপে প্রতিমার অধিষ্ঠান। কলকাতার মতো আলোর তীব্রতা এখানে চোখকে পীড়ন করে না, মাইকের উন্মত্ত আওয়াজ মস্তিষ্কের কোষ ঝালাপালা করে না। ভালো লাগে দেখে যে এখানকার পুজো শুধু বাঙালির নয়, কোল মুণ্ডা সাঁওতালদেরও পুজো। পুজোর ক’দিন মন্ডপে মন্ডপে আদিবাসীরাও নৃত্যগীত পরিবেশন করে। মনে পড়লো এককালে পূর্ববাঙলাতেও দেখেছি শারদোৎসব শুধু ব াঙালি হিন্দুর ছিলোনা, মুসলমানেরাও ছিলো। আজ যখন মন্দির মসজিদের সংঘাত বেড়ে ওঠে তখন মনে হয়, মানুষের উৎসব সমস্ত সামাজিক তাৎপর্য হারিয়ে অর্থহীন এক নেশায় পরিণত হচ্ছে। এই উপমহাদেশের সমাজ - জীবনে এর চেয়ে বড় কলঙ্ক বোধহয় আর কিছু নেই।
ঘাটশিলা ও তার আশপাশের দর্শনীয় স্থান ইচ্ছে করলে একদিনেই দেখে নেওয়া যায়। এ ব্যাপারে জীপ, ট্যাক্সি, ট্রেক ার, অটো, মিনিবাস কোনোকিছুরই অভাব নেই কিন্তু বেড়ানোটা দ্রুশ্বাস না করাই ভালো। পরের দিন আমরা শুধু পার্শ্ববর্তী স্থানগুলি দেখার জন্য একটি মিনিবাস নিলাম। মাথাপিছু চল্লিশ টাকা। ধীরে সুস্থে প্রাতরাশ সেরে সকাল দশটা নাগাদ রওনা। লেভেল ক্রশিং পেরিয়ে ন্যাশনাল হাইওয়ে লিংক রোড বা কলেজ রোড ধরে যেতে ডানদিকে ঘাটশিলা কলেজ এবং বাঁদিকে পড়ে বিভূতি সংস্কৃতি সংসদ। হাইওয়ের পাশেই ফুলডুংরি টিলা। উচচতা সামান্য হলেও এর নামডাক কিন্তু অসামান্য। ঘাটশিলা এসে ফুলডুংরি না দেখলে পুরো বেড়ানোটাই নাকি অসম্পূর্ণ থাকে। টিলার পাদদেশেই রয়েছে সরকারি ইনস্পেকশান বাংলো। পুরো জায়গাটি নানা গাছ গাছালিতে ঢাকা। প্রধান প্রবেশপথে এককালে জমকালো লে াহার গেট ছিলো বোঝা যায়। এখান থেকেই পাকদন্ডি পথ উঠে গেছে উপরের দিকে। অনায়সে হেটে যাওয়া যায়। চূড়ায় অনেকটা প্রশস্ত জায়গা, ছোট্ট মালভূমির মতো। বৃত্তাকারে শালগাছের সারি। দু’দণ্ড বসতে ইচ্ছে করে। এখান থেকে সূর্য াস্ত দেখার জন্য অনেকেই বিকেলবেলা ফুলডুংরি আসেন। উপর থেকে তাকালে একদিকে সদাব্যস্ত জাতীয় সড়ক, অন্যদিকে দিগন্তবিস্তৃত নির্জন মাঠে বুড়ি ধারাগিরির দিকে। দূরে ধূসর পাহাড়ের অসমান মানচিত্র। ধারাগিরি এ এলাকার একমাত্র চিত্তাকর্ষক জলপ্রপাত। দূরত্ব ১৬ কিলোমিটার। কিন্তু অটো ছাড়া অন্য কোনো গাড়ির ধারাগিরি পর্যন্ত যেতে প ারে না। সেক্ষেত্রে বাসাডেরা নামক একটি গ্রামে গাড়ি রেখে ১ কিলোমিটারের মতো পথ হেটে যেতে হয়। বুড়িতে যদি য াবার পথে নামা না হয়, তবে ফেরার পথে অবশ্যই নামা উচিত। চলতি কথায় ড্যাম বলা হলেও প্রকৃতপক্ষে বুড়ি একটি জলাধার। সবুজ বনানী ঢাকা পাহাড়ের সানুদেশে প্রাকৃতিক মেঘের আড়াল থেকে নেমে আসা সূর্যের কিরণ আলোছায়ার যে অদ্ভুত লুকোচুরি খেলে যায় দেখতে দেখতে নয়ন জুড়িয়ে যায়। টিকরি, পাথরগোড়া, বাসাডেরা প্রভৃতি আশপাশের প াহাড়ি গ্রাম থেকে নেমে আসা আদিবাসী ও ভূমিজ সম্প্রদায়ের মানুষ যাওয়া আসার পথে হ্রদের স্নিগ্ধ জলে স্নান সেরে নেয়। হ্রদের একেবারে পাশে এখন আর কোনো গ্রাম নেই। বর্ষার জলোচ্ছ্বাসে বাঘমুণ্ডি, মুড়াহিলের নাম এখন ইতিহাস হয়ে গেছে। সেইসব ঘরভাঙা মানুষেরা ফুলডুংরির কাছে নতুন ঘর বেঁধেছে। বাসাডেরা গাঁয়ের ভূমিজ ভূতনাথ সিং - এর কাছে এসব গল্প শুনতে শুনতে আমাদের গাড়িতে ওঠার সময় হয়ে যায়। উধাও মাঠের ধূলোময় রাস্তা দিয়ে আবার আমরা হাইওয়েতে ফিরে আসি। ফুলডুংরিকে ডান দিকে রেখে এবার গাড়ি ছুটলো গালুডির দিকে। ডি মানে ডিহি বা উঁচু জায়গা। ঘাটশিলা থেকে গালুডির দূরত্ব দশ কিলোমিটার। ট্রেনেও যাওয়া যায়। বিভূতিভূষণ হেটে গিয়েছিলেন। হ

াটা পথের সে বর্ণনা তাঁর 'বনে - পাহাড়ে' বইতে লেখা আছে। এখানকার প্রধান আকর্ষণ সুবর্ণরেখার উপর নির্মিত ব্যারেজ এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পর্যটন বিভাগের সহযোগিতায় নির্মিত অত্যাধুনিক রিসর্ট 'সুবর্ণরেখা।'

গালুডি থেকে একটি রাস্তা গেছে যদুগোড়ায়। সাতের দশকে নকশালপন্থীদের মুক্তাঞ্চল হিসেবে সংবাদশীর্ষে উঠে আসা এইযদুগোড়ায় অবস্থিত রঙ্কিনী দেবী মন্দিরে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ আসে নানান মনস্কামনা নিয়ে। দেবী নাকি খুবই জাগ্রত। ঘাটশিলা থেকে যদুগোড়ার দূরত্ব ২৪ কিলোমিটার। রাস্তাও ভালো। কিন্তু গালুডি থেকে যে পথে আমরা যদুগোড়া এলাম, এ রাস্তার গায়েই রঙ্কিনী মন্দির, তার অনেকটা নিচেয় লম্বা স্নিগ্ধ জলাশয়। সেই নিস্তরঙ্গ জলের বুকে উপরের শ্যামসুন্দর বনানীর ছায়া কাঁপে সারাদিন। আমাদের গাড়ি মন্দিরের কাছে থামতেই সবাই যে যার মতো এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়লো। খুবই সাধারণ মানের মন্দির। ভেতরে চিত্তাকর্ষক কোনো বিগ্রহ নেই। সিঁদুরচর্চিত প্রস্তরখন্ডই আরাধ্য দেবী। জনশ্রুতি আছে, এককালে এ জায়গায় প্রায়শই পথদুর্ঘটনা ঘটতো। তারপর কবে থেকে ওই শিলাখন্ডপুজো পেতে শু করেছে কেউ জানে না। কাঠেপিঠে কোনো লোকালয়ও নেই। ১৯১৬ সালে মাইলখানেকদূরের এক গ্রামের ভূমিজ পরিবারের দুই ভাই মানসিং ও গুণ সিং মানুষের দৈবী বিশ্বাসকে আশ্রয় করে একটি মন্দির গড়ে তোলেন। পরে আরও উন্নয়নের সাথে সাথে পাশেই গণেশের মূর্তি বসিয়ে আরও একটি মন্দির নির্মাণ করেন।

আমার কপাল ভালো, মানসিংকে কাছেই পেয়ে গেলাম। বুড়ো মানুষ। মন্দিরের সামনে একটি চেয়ার পেতে বসে ছিলেন। নামস্কার জানিয়ে জানতে চাইলাম রোজ কত দর্শনার্থী আসেন, কত আয় হয়, রাতে থাকার ব্যবস্থা আছে কী না ইত্যাদি। জানা গেলে, ভ্রমণ মরশুমে (সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি) গড়ে রোজ শ'খানেক দর্শনার্থী হয়। এই সময় মানত ও প্রণামী নিয়ে আয় মন্দ হয় না। কিন্তু বাকি মাসগুলি 'ডাল সিজিন'। রঙ্কিনী মন্দিরের কাছাকাছি রাস্তার অপর পারে আরও একটি মন্দির আছে। রাধাগোবিন্দের। নির্মাণকালে ১৯৮১। অপেক্ষাকৃত নতুন এই মন্দিরের গায়ে নানা রঙে আঁকা আছে লতাপাতা, পাখপাখালি সহ পুরাণ ও ইতিহাসের খন্ডচিত্র এমনকী বন্দুকধারী সিপাহী পর্যন্ত। গোটা ব্যাপারটা মোটা দাগের। মন ভরে না।

এখান থেকে রাজদোয়া হয়ে নারোয়া যাওয়া যায়। টাটা গেলে টেলকো টাউনশিপ্ হাডকো লেক, ভুবনেশ্বরী মন্দির, বিষ্টুপুর দেখে কিনান স্টেডিয়াম, মোদিপার্ক, জুবিলি পার্ক হয়ে ডিমনা লেকে যাওয়া যেতে পারে। রাস্তা সাকুল্যে ২০০ কিলোমিটারের মতো। আমরা যদুগোড়া থেকেই ফিরলাম। বেলা গড়িয়ে গেছে। পথে পাঞ্জাবি হোটেলে লাঞ্চ খেয়ে সোজা রাস্তায় মৌভান্ডার হয়ে ঘাটশিলা আসতে আসতে সাড়ে তিনটে। পথে পড়ে ইউরেনিয়াম ও কপার ফ্যাক্টরী। কিন্তু সেখানে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ নিষেধ।

ফুলডুংরির কথা আগেই বলেছি। ঘাটশিলা অবস্থানকালে রোজই ইচ্ছে করলে একবার ফুলডুংরি যাওয়া যেতে পারে। সকালে কিংবা বিকেলে। আমরা পরদিন সকালে উঠে ধলভূম এস্টেটের রাজবাড়ি দেখতে গেলাম। রেলস্টেশান থেকে বেরিয়ে বাঁদিকে রাস্তাধরে বাজার পেরিয়ে গেলে এই রাজবাড়ি। বিশাল কিছু নয় তবু চৌহদ্দি বেশ বড়। এর একাংশে এখন স্থানীয় এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জেরঅফিস, অপরাংশে ঘাটশিলা কোর্ট। ছাতে উঠলে বোঝা যায় রাজবাড়িতে যা যা থাকার একদা এখানেও সেসব ছিলো। দক্ষিণদিকের পর্যবেক্ষণ টাওয়ারটি এখানে ভগ্নপ্রায়। ভেতরের প্রাঙ্গণ আগাছা আর জঙ্গলে ভর্তি। শুনলাম রাজপরিবারের কেউই আর এখানে থাকেনা। প্রাসাদের পেছন দিকে সুবর্ণরেখা। নদী এখানে বেশ প্রশস্ত। মাথা উঁচু করে অসংখ্য পাথরের ফাঁকে ফাঁকে বয়ে চলা স্রোতস্বিনী। অনেকক্ষণ বসে থাকার ইচ্ছে হয়। পূবদিকে অপেক্ষাকৃত উঁচু পাহাড়ি গ্রাম। আদিবাসী মেয়েরা জল নিয়ে উঠে যায়। ভালো লাগে জীবনের এই চলমান দৃশ্য। রাজবাড়ির সামনেই দোকান আছে। সকালে ভাজা গরম কচুরী এবং খুশিমতো মিষ্টিতে প্রাতরাশ সেরে নেওয়া যায়। ফেরার পথে থানার কাছে আর একটি মন্দির পাওয়া যাবে। এটাও রঙ্কিনী মন্দির। সামনেই পেল্লায় হাড়িকাঠের পাশাপাশি রয়েছে ছাগবলির জন্য ছোট হাড়িকাঠ। বড় হাড়িকাঠে মোষ বলি হয়। বাজার এলাকা থেকে বাঁ হাতে একটি রাস্তা গেছে ফেরিঘাটে। ইচ্ছে হলে ফেরি পার হয়ে সুর্বর্ণরেখার ওপারে আদিবাসী গ্রামগুলি একপাক ঘুরে আসা যেতে পারে। ফেরিঘাটে দাঁড়ালে দেখা যাবে দূরে হিন্দুস্থান কপার ফ্যাক্টরীর চিমনি থেকে নির্গত ধুয়া মহাশূন্যে মিশে যাচ্ছে। তারও পেছনে সুরদা মুসাবনির অরণ্যঘেরা ধূসর পাহাড়ের সারিবদ্ধ শিখর।

সকালের নিসর্গ দর্শন শেষে ঘরে ফিরে স্নানাহার বিশ্রাম সেরে বিকেলে চলুন মৌভান্ডার। স্টেশন থেকে ৪ কিলোমিটার।

অটো আছে। সার্ভিস বাস আছে। আছে সাইকেল রিক্‌শাও। আর আপনার এগারো নম্বর তো আপনার সাথেই আছে। মৌভাণ্ডারে প্রধান দর্শনীয় বস্তু তাম্র শোধনাগার। ভেতরে যেতে হলে অনুমতি লাগে। অন্যথায় বাইরে থেকে দুধের সাধ ঘোলে মেটাতে হয়। দুঃখ কী, সুবর্ণরেখা ব্রিজের উপর দাঁড়ালে প্রকৃতিই অকৃপণ হাতে দুঃখমোচন করবে। এখানে সুবর্ণরেখার বক্ষ জুড়ে চিকচিক করছে বালি আর জেগে থাকা পাথরের অসংখ্য মাথা। পাহাড় এখান থেকে আরও কাছে। পাঁচ - ছয় কিলোমিটার দূরেই পাহাড় - সংকুল সুরদা মুসাবনির খনি অঞ্চল। ওখান থেকেই তামার আকর আসে শোধনাগারে।

সবকিছু দেখেও বাঙালির ঘাটশিলা দর্শন কিন্তু বিভূতিভূষণকে স্পর্শ না করলে অসম্পূর্ণ থাকে। প্রতিবছর অসংখ্য বাঙালি ভ্রমণার্থী ঘাটশিলা যান। মূলত পুজোর সময় থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত চলে এই বেড়ানোর মরশুম। নিসর্গ ছাড়াও তাঁরা অবধারিতভাবে আর যেটা দেখতে চান তা হলো বিভূতিভূষণের বাড়ি এবং বিভূতি সংস্কৃতি সংসদ। কিন্তু সেখানে যে একরাশ হতাশা অপেক্ষা করে আছেসেটা না পৌঁছানো পর্যন্ত অজ্ঞাত থেকে যায়। ঘাটশিলা রেলস্টেশন থেকে প্রায় দু'কিলোমিটার দূরে দহিগোড়া এলাকায় 'অপুর পথ' অপুর পথ বলে অনেকেই হদিশ দিতে পারেন না। বরং বিভূতিভূষণের বাড়ি বললেই খুঁজে পাওয়া সহজতর।

দহিগোড়ার এই রাস্তা ধরেই 'সাফারি', 'আনন্দিতা' হোটেল পেরিয়ে কিছুটা এগোলেই সেই বাড়ি। বাড়ি বলতে টালির চালওয়ালা বড় একখানা ঘর। বেড়াগুলি টিনের। বিভূতিবাবুর সময়ে ঘরের বারান্দা ছিলো খোলা। এখন সেটা ঘেরা। কোনো প্রাচীর বেষ্টন নেই। বাড়ি সংলগ্ন জমি আছে ১৭ শতক। ১৯৫০ সালের ২৯ অক্টোবর ধলভূম রাজবাড়িতে নেমন্তন্ন খেয়ে অসুস্থ বিভূতিভূষণ ১ নভেম্বর এই বাড়িতেই শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। ঘাটশিলা চিরকালের মতো তাঁকে বক্ষে তুলে নেয়। খবর পেয়ে তিন বছরের শিশুপুত্র তারাদাসকে কোলে নিয়ে তাঁর স্ত্রী ছুটে আসে ঘাটশিলায়। দুইজন বিধবা মহিলার পক্ষে ঘাটশিলা থাকা অসম্ভব হওয়ায় জনৈক ফেলু চ্যাটার্জীকে বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। সেই থেকে বাড়িটির বাসিন্দা এই চ্যাটার্জী পরিবার। ফেলুচ্যাটার্জী মারা যাবার পর তাঁর ছেলে হিন্দুস্তান কপারের কর্মচারী স্বপন চ্যাটাজী (টুলু) বহুবছর কোনও দর্শনার্থীকে বাড়িতে ঢুকতে দেন নাই। এই বাড়িকে কেন্দ্র করে বিভূতি পুত্র তারাদাসের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক রীতিমত তিক্ত। তারাদাস অনেক চেষ্টা করেও বাড়িটিরদখল পাননি। এখন ঝাড়খণ্ড রাজ্য সরকারের মাধ্যমে বাড়িটি অধিগ্রহণ করার চেষ্টা চলছে। ইতিমধ্যে স্থানীয় লোকসভা - সদস্য সুনীল মাহাতো তাঁর এম. পি ল্যাড থেকে সাড়ে নয় লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেছেন। তা নিয়েও জটিলতার শেষ নেই। শেষ পর্যন্ত টাকা পেলে হয়তো বিভূতি সংস্কৃতি সংসদ বাড়িটির সংস্কার ও উন্নয়নের হাত লাগাবে। এখানে একটি ছোট মিউজিয়াম প্রতিষ্ঠারও পরিকল্পনা আছে। তবে না আঁসলে কিছুই বিশ্বাস নেই।

হতাশার আর একটি কেন্দ্র বিভূতি সংস্কৃতি সংসদ। কলেজ রোডের পাশে পাঁচ একর জমির মধ্যে ১৯৫১ সালে প্রতিষ্ঠিত এই সংসদ। রাস্তা থেকেই তার সুদৃশ্য বাড়িটি দেখা যায়। এখানে একটি পাঠাগার সহ একটি সঙ্গীতায়ন (মেঘমল্লার) ও অঙ্কন শিক্ষাকেন্দ্র আছে।

ঘাটশিলায় বিভূতিচর্চার উদ্দেশ্যেই সংসদের জন্ম কিন্তু আর পাঁচটা বাঙালি পরিচালিত সংস্থার মতোই দশা সংসদের সিংহভাগ জমিই এখন হাতছাড়া। সংসদের কাজে আত্মনিয়োগ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে অনেক সদস্যই নামমাত্র মূল্যে জমি নিয়ে ঘরবাড়ি করেনিয়েছেন। এখন পাঠাগার খোলার লোক মেলে না। সঙ্গীত ও অঙ্কন শিক্ষার ব্যবস্থা শিকেয় ওঠার মতো। গেস্টরুম ভাড়া দিয়ে কিছু আয় রোজগার হয়। কিন্তু সাংস্কৃতিক কাজকর্মের কোনো ধারা নেই। বিভূতিচর্চা বা গবেষণার সুযোগ তো নেই-ই। কলকাতা তথা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকে অসংখ্য বাঙালি ভ্রমণার্থী যে প্রত্যাশা নিয়ে সংসদ দেখতে যান, ফেরার সময় হাতে নিয়ে আসেন সেই প্রত্যাশার চুর্ণিত অনুকনা।

তবে ভ্রমণের চেয়ে যাঁরা স্বল্পকালীন বিশ্রামের জন্য ঘাটশিলা যান, দিগন্ত প্রসারিত শ্যামল নিসর্গ, পরিচ্ছন্ন নিলীম আকাশ, নিদ্বেগ তপস্বিনী সুবর্ণরেখার মনোরম নদীতট তাঁদের আজও নিরাশ করে না।

Zoom In | Zoom Out | Close | Print | Home

Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com